Semester II

CC-3: History of India, c. 300 to 750 CE
Topic IV b and C
Dr. Juthika Barma

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যে ৬৩টি প্রতিবাদী ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। গৌতম বুদ্ধ এই ধর্মের প্রবর্তক। খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ সালে হিমালয়ের পাদদেশে লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে সিদ্ধার্থ নগর পরিভ্রমনণকালে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর স্বরূপ দেখে অনুধাবন করেন জগতে সুখ অপেক্ষা দুঃখের পরিমান বেশি। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় উদ্ভাবনের জন্য ২৯ বছর বয়সে তিনি রাজ সিংহাসন, স্ত্রী, পিতা ও সদ্যোজাত শিশুপুত্রসহ সব কিছু ত্যাগ করে সন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। দুঃখজয়ের পথের সন্ধানে ছয় বছর কঠোর সাধনার পর অবশেষে এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ চরম সত্য বোধি লাভ করে বুদ্ধ নামে আখ্যায়িত হন (খ্রি.পূ. ৫৮৮)। ঋষিপতন মৃগদাব অর্থাৎ সারনাথে তিনি সর্বপ্রথম সকল প্রাণির সুখ ও কল্যাণার্থে সত্যধর্মের প্রচার আরম্ভ করেন। দীর্ঘ ৪৫ বছর তিনি বিরামহীনভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সকল প্রাণির মঙ্গল কামনায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার বাণী প্রচার করেন। তাঁর ধর্মের মর্মবাণী হলো—এ ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দ্রষ্টব্য; এ ধর্মপালনে কোনো কালাকাল নেই। এ ধর্মে কোনো জাতপাত/জাত অজাত নেই, গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাসও নেই। ‘এসো, দেখো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মনঃপুত হলে নৈর্বানিক ধর্ম গ্রহণ করার’ বুদ্ধের এ নিরপেক্ষ ও যুগোপযুগী আহ্বান সকল স্তরের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। তারা দলে দলে দীক্ষিত হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মে। সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী মুক্তিদাতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মকে। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে অর্থাৎ খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে বাংলার পালযুগের অবসান পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর বৌদ্ধধর্ম এ উপমহাদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

বৌদ্ধ সম্মেলন ও বিভাজন

বুদ্ধের সময়েই ভিক্ষুসংঘে নানা বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর সেটা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। এই বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য

আনুমানিক খ্রি.পূ. ৪৮৩ অব্দে প্রথম ধর্ম মহাসেম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বুদ্ধের 'বিনয়' ও 'সূত্রগুলোকে' সংকলিত করা হয়। কিন্তু অনেক ভিক্ষু এই বিষয়টি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা মুল ভিক্ষুসংঘ থেকে সরে যান। এই সম্মেলনে সংকলিত বুদ্ধের বিনয় ও ধর্মকে যারা মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা **'স্থবিরবাদী' বা 'থেরবাদী'** নামে পরিচিতি লাভ করলেন। সুতরাং বলা যায় এই সম্মেলনে ভিক্ষুদের অনৈক্য দূরীভূত হয় নি।

প্রথম সম্মেলনের ঠিক একশ বছর পর খ্রি.পূ. ৩৮৩ অব্দে বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন বিচ্ছেদবাদী ভিক্ষুদের নানারূপ আপত্তিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই সম্মেলনের শেষে প্রায় দশ হাজার ভিক্ষুদের ভিক্ষুসংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই বিদ্রোহী ভিক্ষুরা বৈশালীর আর একটি অঞ্চলে নিজেদের নিয়ে অধিবেশন করেন। তাঁরা বুদ্ধের নীতি ও আদর্শের মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটায়। এঁরা **'মহাসাঙ্ঘিক' ভিক্ষুগোষ্ঠী** হিসেবে পরিগণিত হন। সুতরাং একশ বছরের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, স্থবিরবাদী বা থেরবাদী ও মহাসাঙ্ঘিক। মহাসাঙ্ঘিকরা বুদ্ধের ধর্ম ও নীতি থেকে বহু দূরে সরে যান। আর স্থবিরবাদীরা বুদ্ধের নীতি ও আদর্শ ধরে রইলেন। কিন্তু তাঁরাও বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম ও আদর্শ নিয়ে বেশি দিন থাকতে পারলেন না। ক্রমে এই স্থবিরবাদ থেকে বেরিয়ে এলো **'মহিশাসক', 'সর্বাস্তিবাদী', 'সম্মিতীয়' ও 'সৌত্রান্তিক'** ভিক্ষু গোষ্ঠীসহ সর্বমোট এগারোটি গোষ্ঠীর। মহাসাঙ্ঘিকরাও **'লোকোত্তরবাদী'** ভিক্ষু গোষ্ঠীসহ সাতটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম আঠারোটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

খ্রি.পূ. ২৪৭ অব্দে মৌর্য সম্রাট অশোক পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ ধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠান করেন। তিনি ছিলেন থেরবাদী বৌদ্ধ। কিন্তু তিনিও ভিক্ষুসঙ্ঘে ঐক্যস্থাপন করতে পারেন নি। এই সম্মেলনের পর থেরবাদী মতাদর্শ ভারত থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তার স্থান অধিকার করেছিল মহাসাঙ্ঘিকরা। তাঁদের উদার-নীতি, পূজা, দান, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি মতাবাদ সাধারণ জনমানসে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিও এইসময় মহাসাঙ্ঘিকদের ছত্রছায়ায় চলে আসে। এই মহাসানঙ্ঘহিকরাই চতুর্থ ধর্ম মহাসম্মেলনে (কণিষ্কের সময় খ্রি.১ম শতকে) নিজেদের **'মহাযানী'** বলে অভিহিত করল। আর স্থবিরবাদীরা হল **'হীনযানী'** সম্প্রদায়।

হীনযানীরা প্রাচীন আদর্শকে আঁকড়ে থাকেন। তাঁরা বুদ্ধের নীতি, আদর্শ মেনে চলল। কিন্তু মহাযানীরা তা সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। তাঁরা বুদ্ধকে লোকোত্তর বলে গ্রহণ করে তাঁর উপর

অলৌকিকতা আরোপ করছিলেন। তারা অসংখ্য বুদ্ধ, দেবতা, স্বর্গ, নরক প্রভৃতির সংযোজন ঘটান এই ধর্মের মধ্যে। পূজা, অর্চনা, নানা ক্রিয়া-কাণ্ড তাঁরা বৌদ্ধধর্মে অন্তর্ভুক্তি করেন। এইভাবে বৌদ্ধধর্মে নানা দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে খ্রি. ১ম শতকের পর মহাযানী ধর্মবিশ্বাস বাংলায় প্রবেশ করে। তাঁরাই বাংলায় বুদ্ধ পূজার উদ্ভব করে। নানা দেব-দেবীর পূজার উদ্ভবও করে তারা। এইভাবে বাংলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে হীনযানীদের সাথে মহাযানীদের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ দুরকম বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব তখন বঙ্গভূমিতে লক্ষ করা যায়।

মৌর্যযুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ঠ প্রভাব ছিল। তার উল্লেখ রয়েছে চীনা পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ও বৌদ্ধ 'দিব্যবদান' গ্রন্থে। চীনা পরিব্রাজক হিউ-ইয়েন-সাঙ সম্রাট অশোকের তৈরি কিছু স্তূপ দেখেছিলেন কর্ণসুবর্ণ, পুণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্ততে। খ্রি.পূ. ২য় শতাব্দীতে বাংলার দুই বৌদ্ধ অধিবাসী ঋষি নন্দন ও শ্রীমতি ধর্মদতা, সাঁচির বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপের বেষ্টনী ও তোরণ তৈরির জন্য প্রভূত অর্থ প্রদান করেন। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ততে প্রায় দুবছর কাল অতিবাহিত করেছিলেন। তিনিও সেই সময় তাম্রলিপ্ততে বহু বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন। খ্রিঃপূঃ তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক বাংলায় প্রায় সত্তরটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। পুণ্ড্রবর্ধনে প্রায় কুড়িটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। এখানে হীনযানী ও মহাযানী সম্প্রদায় মিলিয়ে প্রায় তিন হাজারের বেশী ভিক্ষু ছিলেন। সমতটে ছিল ত্রিশটি বৌদ্ধ বহার। যার বেশিরভাগ ছিল মহাযানী ভিক্ষুদের। কর্ণসুবর্ণে ছিল দশাধিক বৌদ্ধ বিহার। এখানেও ছিল মহাযানীদের প্রভাব। তাম্রলিপ্ততেই প্রায় বাইশটি বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ছাড়া ভিক্ষুনীরাও থাকত এই সব বিহারে। এখানেও মহাযানীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। কজঙ্গলেও প্রচুর বৌদ্ধ বিহার দেখা যায়, যেখানে মহাযানীদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে বাংলার স্থানীয় অধিবাসী ভিক্ষুরা ছিলেন হীনযানী সম্প্রদায়ের।

বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিকতা

মন্ত্র, তুকতাক, বশীকরণ ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছিল অথর্ববেদের আমলে। অথর্ব বেদের মানুষ দেবতার মুখাপেক্ষি না হয়ে নিজেই মন্ত্রশক্তির বলে ইচ্ছাপূরণে সচেষ্ট হয়েছিল। দেবতার নামে যজ্ঞ করলে দেবতা তুষ্ট হয়ে যজ্ঞকারীর অভিষ্ট সিদ্ধি করবে, এটা আদিকালে মানুষ বিশ্বাসও

করলেও, পরবর্তীকালে মানুষ সম্পূর্ণ দেবতা নির্ভর না হয়ে নিজেই তার অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য মন্ত্র, বশীকরণ, তুকতাক ইত্যাদির উদ্ভব করল। নিজের শক্তি দ্বারা বহির্শক্তিকে জয় করাই ছিল উদ্দেশ্য। সাধনার দ্বারা শক্তি অর্জন করে নিজের ভাল বা অন্যের মন্দ করাই ছিল মন্ত্রশক্তি উদ্ভবের মূলে। অথর্ববেদে এই রূপ সাধনার নিয়মাবলীরও উল্লেখ আছে। সুতরাং তুকতাক, বশীকরণ, মন্ত্রশক্তি, প্রাচীনকালে থেকে ভারতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে জড়িত ছিল। লোকসমাজে প্রচলিত এইসমস্ত বিশ্বাস মহাযানী সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করে। প্রাচীন বৃক্ষ পূজা, লিঙ্গ-যোনি পূজা, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, ডাকিনী, যোগিনী, দিকপাল ইত্যাদির পূজা, হারিতি পূজা, জাঙ্গুলি পূজা প্রভৃতি মহাযানী ধর্মে স্থান পেল। এই সব পূজা, যাদু, টোনা, তুকতাক ইত্যাদি নিজেদের আত্মরক্ষার কবচ হিসেবে ধর্মে প্রাধান্য পেল।

মহাযানী ভিক্ষুরা বহু পূর্ব থেকে অলৌকিক শক্তি লাভের আশায় গোপনে তন্ত্র সাধনা করতেন। এই সব ভিক্ষুরা গোপনে '*গুহ্যসমাজ* নামে নিজেদের দলও গড়লেন। খ্রিঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে মহাযানী বৌদ্ধরা *'মঞ্জুশ্রী মূলকল্প'* নামে তন্ত্র সাধনার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের অনুকরণে '*গুহ্যসমাজ* খ্রিঃ তৃতীয় শতকে '*গুহ্যসমাজতন্ত্র* নামে তন্ত্রের আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রিঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে আচার্য ভিক্ষু অসঙ্গ '*গুহ্যসমাজতন্ত্র* গ্রন্থের অনুকরণে *'প্রজ্ঞা পারমিতা'* নামক তন্ত্র সাধনার গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং বলা যায়, খ্রিঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতেই বাংলার প্রথম তন্ত্র সাধনার উদ্ভব করেন মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই। তবে এর বিকাশ ঘটে খ্রিঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে।

মহাযানীদের মধ্যে তখন তন্ত্র সাধনা ছিল বলে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের প্রাচীন প্রথাগুলোকে তাঁরা উপেক্ষা করেননি। সেগুলো তাঁরা ধর্মে গ্রহণ করলেন সেই সকল মানুষদের বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য। তন্ত্র সাধনাকেই জোরদার করলেন মহাযানীরা।

নাগার্জুনের 'শূন্যবাদের' সহজ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাযানী পন্ডিত ভিক্ষুরা বাংলাদেশে তন্ত্রসাধনা বৌদ্ধ ধ্যানতত্ত্বের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করলেন (খ্রিঃ সপ্তম শতকে)। সাধারণ মানুষ শূন্যবাদের তত্ত্বকথা ও ধ্যানের বিভিন্ন স্তরগুলো সহজে বুঝতে পারেলেন না। তাঁদের কাছে ধ্যানের চাইতে মন্ত্রই হলো মূল প্রেরণা। তাঁরা যাদুমন্ত্র, ধারণী, বীজ ইত্যাদি সহজে বুঝতেন। মহাযানী পণ্ডিতরা তাই তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের সারবস্তুকে বোঝালেন। ধর্মের গূঢ়তত্ত্বকে তাঁরা তন্ত্রের মাধ্যমে সহজে সকলের বোধগম্য করে তুললেন। এইভাবে সপ্তম

শতকে বাংলা হয়ে উঠল তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান। তিব্বতী সূত্রে উল্লেখ পাই যে খ্রিঃ সপ্তম শতকে মহাযানী তন্ত্রসাধনা বাংলায় আত্মপ্রকাশ করে ধর্মকীর্তির সময়। বাংলাতে এইসময় অনেক তান্ত্রিক আচার্য ছিলেন, যাঁরা বিহারে অবস্থান করে তন্ত্র সাধনার শিক্ষা দিতেন। বিক্রমপুরের বিহারে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য ভিক্ষু কুমারচন্দ্র। চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারে ছিলেন তন্ত্রাচার্য ভিক্ষু তৈলপাদ। বগুড়া ও কৃষ্ণনগরের বিহার দুটিও ছিল তন্ত্র সাধনার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। এইসময় প্রায় চুরাশি জন তন্ত্রসিদ্ধাচার্য এই দেশে ছিলেন। এঁদের মাধ্যমেই মহাযানী তন্ত্রসাধনার বিকাশ ঘটেছিল এই দেশ।

মন্ত্রযান ও বজ্রযান

মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তন্ত্রসাধনাকে বৌদ্ধ ধর্মদর্শনে ঢুকিয়ে নিয়ে মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মে এক নতুন ধ্যান কল্পনা গড়ে তুললেন। মূল প্রেরণা হল 'মন্ত্র' আর তার সাথে যুক্ত হল 'ধারণী' ও 'বীজ'। এই নতুন ধ্যান কল্পনার পথই হলো 'মন্ত্রযান'। **'মন্ত্রযান'** ও **'বজ্রযান'** এই দুই প্রকার তন্ত্রসাধনার উদ্ভব হল মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মে। আর এই ধ্যান কল্পনার গোড়াপত্তন হল এই বাংলাতে।

মহাযানী ভিক্ষুরা তন্ত্রসাধনাকেই সঠিক ধ্যান পদ্ধতি বলে মনে করলেন। তারা বুদ্ধের বিপস্সনা ধ্যানকে সরিয়ে রাখলেন। আর অন্যদিকে হীনযানীরা বুদ্ধের প্রদর্শিত পথকে আঁকড়ে রইলেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু শীলভদ্র। বাংলাতে মহাযানীরা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মূলত নিম্নবর্ণীয় হাড়ি, শবর, জেলে, মুচি, কুমার, ডোম, মাঝি, চণ্ডাল, পৌণ্ড্র প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। এঁদের মধ্য দিয়েই মহাযানীরা তাঁদের নব্য তন্ত্রসাধনার প্রথম বিকাশ ঘটিয়েছিল।

তন্ত্রসাধনা হল এক বিশেষ ধ্যান পদ্ধতি যার দ্বারা সহজে সাধক সিদ্ধিলাভ করে। বুদ্ধের শীল, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চিত্ত শুদ্ধি, ইত্যাদি কঠিন বিষয়গুলি এই ধ্যানে নিষ্প্রয়োজন। তন্ত্রসাধনার একটি ভাগকে বলা হয় মন্ত্রযান। এইরূপ তন্ত্রসাধনায় সাধক তার মূল বীজমন্ত্র মনে মনে জপ করে ধ্যানে মগ্ন হবে। এই বীজ মন্ত্রই সাধককে শক্তি দেবে, তার মনকে স্থির করবে। তখন সাধক সেই ধ্যানের মধ্যে নানা রঙ, নানা রূপ প্রত্যক্ষ করবে। নানা বীভৎস রূপ তার সামনে ছায়াছবির মতো উদয় হবে। সেই কাল্পনিক রূপকে দেব বা দেবী বলে মেনে নিয়ে তাঁদের ধ্যান করাই হচ্ছে মন্ত্রযান তন্ত্রসাধনার মূল বিষয়। সেই দেব-দেবীই সাধককে মুক্তির পথ দেখাবেন

ও জাগতিক মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন। সংক্ষেপে এই হচ্ছে তন্ত্রসাধনার 'মন্ত্রযান' ধ্যান পদ্ধতি।

এই মন্ত্রযান তন্ত্রে সাধক চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করে অন্তরের অগ্নি শক্তিকে কার্যকরি করে। সেই শক্তি মনের ভয়-ভীতি দূর করে সাধককে শক্তিপ্রদান করে মুক্তির পথ ধারায়। এই সাধনার মাধ্যমেই মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মে বহু দেব-দেবীর উদ্ভব হয়েছে। যেমন তারা, হারিতি, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী প্রভৃতি দেবী মহাযানীরা মন্ত্রযান ধ্যানের মাধ্যমেই লাভ করেছে। এইভাবে অসংখ্য দেব-দেবীর সৃষ্টি হয়েছে। আসলে কল্পনার বাইরে এদের কোন অস্তিত্ব নেই।

দ্বিতীয় প্রকার তন্ত্র সাধনাকে বলা হয় 'বজ্রযান' সাধনা। শূন্যবাদীদের কাছে নির্বাণ হচ্ছে শূন্যতার পরম জ্ঞান। নির্বাণ প্রাপ্তি হচ্ছে জীবের পরম সুখ। শূন্যরূপ নির্বাণকে এই তন্ত্র সাধনায় কল্পনা করা হল দেবীরূপে। আর যে চিত্তে বোধিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞানের সংকল্প রয়েছে, তাকে বলা হল'বোধিচিত্ত'। এই বধিচিত্ত ধায়নের মাধ্যমে যখন শূন্যতায় বিলীন হয়, তখনই নিররাবণ বা পরম সুখের উদয়। বলা হয়, বোধিচিত্ত কল্পিত দেবির সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হলেই মহাসুখের উদয় হয়, অর্থাৎ নির্বান লাভ হয়। চিত্তের বজ্রভাবে বোধিজ্ঞান লাভ করা যায়। তাই এই সাধনাকে বলা হয় 'বজ্রযান' তন্ত্র সাধনা।

বজ্রযানীরা বলে, রমণে যে চরম সুখ অনুভব করা যায়, সেই অনুভিতিই হচ্ছে 'বোধিচিত্ত'। এই 'বোধিচিত্তের' জন্য কঠোর যোগসাধনার প্রয়োজন। যোগ সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তি দমন করেই তবেই চিত্ত বজ্রের মতো কঠিন। রমণজাত চরম সুখকে স্থাই করা যায় মন্ত্রের সক্তিতে। আর এর মধ্য দিয়েই ইন্দ্রিয় শক্তিকে দমন করা যায়। এই চরম সুখের সময় অর্থাৎ বোধিচিত্ত বজ্র কঠিন হলে, তখন সাধক দেব-দেবী দেখতে পায়। এই সব দেব-দেবীর ধ্যানে ডুবে গেলে বোধিচিত্ত কঠিন হয়ে সাধকের বোধিজ্ঞান লাভ হয়। বজ্রযানেও অসংখ্য দেব-দেবীর উল্লেখ আছে। মন্ত্র, মুদ্রা, পূজা, আচার, অনুষ্ঠানে ভরা বজ্রযান সাধন মার্গ। মন্ত্রযানেও এই প্রথা রয়েছে। এই বজ্রযান ও মন্ত্রযান সাধনার কারণেই মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মে নানা রকম দেব-দেবীর অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই।